আশা ভোঁসলে

বৈচিত্র্যে ভরপুর ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিগত জীবন

অলকানন্দা মালা

আশা ভোঁসলে ১৯৩৩ সালে ৮ সেপ্টেম্বর ভারতের সঙ্গিল রাজ্যের (বর্তমান মহারাষ্ট্রে অবস্থিত) সঙ্গিল জেলার গৌড়ে জন্মগ্রহণ করেন। সুর সাধকের ঘরে জন্ম আশার। বাবা পণ্ডিত দীননাথ মঙ্গেশকর একাধারে ছিলেন একজন নাট্যকার, অভিনেতা ও গায়ক। তবে বাবার সান্নিধ্য বেশিদিন ভাগ্যে জোটেনি। বয়স যখন ৯ তখন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে স্ত্রী ও ৫ সন্তান ফেলে চিরবিদায় নেন দীননাথ। স্বামীর অবর্তমানে ৫ সন্তান নিয়ে মহাসমুদ্রে পড়েন আশার মা শিবন্তী মঙ্গেশকর। বড় বোন লতার বয়স তখন ১৩। ওই বয়সেই সংসারের হাল ধরেন তিনি। বোনের বোঝা হালকা করতে পাশে দাঁড়ান ৯ বছরের বালিকা আশা। পেট চালাতে কণ্ঠে তোলেন সুর।

চলচ্চিত্র যাত্রা

আশা ভোঁসলে চলচ্চিত্রের ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন মারাঠি ইন্ডাস্ট্রি থেকে। ১৯৪৩ সালে 'মাঝা বল' নামের সিনেমায় 'চল চল নব বল' শিরোনামের গানের মাধ্যমে শুভ সূচনা হয়। সুরকার দত্ত দবজেকরের হাত ধরে এই পথচলা শুরু হয়। এদিকে বাবার মৃত্যুর পর আশা-লতার পরিবার মুম্বাইয়ে থিতু হয়। ফলে বলিউডের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ হয়ে যায়। ১৯৪৮ সালে 'চুনারিয়া' সিনেমায় 'সাবন আয়া' গানের মাধ্যমে বি-টাউনে খাতা খুলেন তিনি।

যে ৪টি সিনেমায় ক্যারিয়ারে উত্থান

সংগীতের সঙ্গে আশা ভোঁসলের পথ চলা ছোটবেলা থেকে। জনপ্রিয়তার হাত ধরেন পঞ্চাশের দশকে এসে। তার পুরো ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে ৪টি সিনেমা। এগুলো হচ্ছে নয়া দৌড়, তিসরি মঞ্জিল, উমরাও জান ও রঙ্গিলা। শুরুটা হয়েছিল নয়া দৌড় দিয়ে। ১৯৫৭ সালের ঘটনা। কয়েক বছর হলো সুরকার ওপি নায়ারের সঙ্গে কাজ করেছেন। সে বছর কণ্ঠ দেন নয়া দৌড় সিনেমার গানে। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। ছবিটি খ্যাতির আলোয় নিয়ে আসে আশাকে। নায়ারের সঙ্গে জুটিও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই জনপ্রিয়তার হাত ধরে হাঁটতে হাটতেই ১৯৬৬ সালে এসে তিসরি মঞ্জিল সিনেমার গানে কণ্ঠ দেন আশা। এ ছবি তার ক্যারিয়ারকে আরও তুঙ্গে নিয়ে যায়। পরে ১৯৮১ সালে ওমরাও জান এবং ৯৫ সালে রঙ্গিলা ছবি দুটি আশা ভোঁসলের ক্যারিয়ার আরও মসৃণ করে তোলে।

চার গুণী সুরকারের কথা

দীর্ঘ ক্যারিয়ারে অসংখ্য সুরকারের সঙ্গে কাজ করেছেন আশা ভোঁসলে। তাদের গান কণ্ঠে তুলেছেন। তবে চারজন সংগীত পরিচালক ও

সুরকারের কথা না বললেই নয়। তাদের মধ্যে প্রথমেই আসে ওপি নায়ারের নাম। আশা ভোঁসলের জনপ্রিয়তার শুরুটা এই সুরকারের হাত ধরে। ১৯৫২ সালে 'ছমছম' শিরোনামের একটি গান রেকর্ডিংয়ের সময় পরিচয় তাদের। পরে ১৯৫৪ সালে 'মঙ্গু' নামের একটি সিনেমায় নায়ারের সুরে গান করেন আশা। তার হাত ধরেই ১৯৫৬ সালে আশা আসেন জনপ্রিয়তার আলোয়। পরে তাদের সম্পর্ক কথা ও সুরে সীমাবদ্ধ ছিল না। যুক্ত হয়েছিল হৃদয়। প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন দুজনে। ওপি নায়ারের সুরে আশার বেশ কিছু জনপ্রিয় গান রয়েছে যা আজও মুগ্ধতা ছড়ায়। এরমধ্যে হাওড়া ব্রিজ সিনেমার 'আইয়ে মেহেরবান', মেরে সনম ছবির 'ইয়ে হ্যায় রেশমি জুলফোঁ কা আন্ধেরা'। কিসমত ছবির 'আও হুজুর তুমকো' এবং মেরে সনম ছবির 'যাইয়ে আপ কাহাঁ' গানগুলো উল্লেখযোগ্য।

বলিউডে একটা সময় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল আশা-মোহাম্মদ রফি জুটি। দুজনের কণ্ঠ জমেছিল বেশ। এর নেপথ্যে ছিলেন ওপি নায়ার। তিনিই এক করেছিলেন আশা-রফিকে। তার সুরে রফি ও আশার জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে নয়া দৌড় ছবির 'উড়ে জব জব জুলফেঁ তেরি', এক মুসাফির এক হাসিনা ছবির 'ম্যাঁয় প্যায়ার কা রাহি হুঁ' এবং কাশ্মীর কি কলি ছবির 'দিওয়ানা হুয়া বাদল' ও 'ইশারোঁ ইশারোঁ মেঁ' উল্লেখযোগ্য।

নায়ারের হাত ধরে জনপ্রিয়তা পেলেও কর্মজীবনের শুরুতে আশাকে বেশি সুযোগ দিয়েছিলেন সুরকার, সংগীত পরিচালক মোহাম্মদ জহুর খইয়াম। ১৯৪৮ সালে একসঙ্গে কাজ শুরু করেন তারা। ৫০ দশকে খইয়ামের সুর ও সঙ্গীতে বেশ কিছু গান করেন আশা। এরমধ্যে দর্দ ও ফির সুবাহ হোগি উল্লেখযোগ্য।

ক্যারিয়ারে অসংখ্য সংগীত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন আশা। তাদের অধিকাংশই এ গায়িকার কণ্ঠের অনুরাগী ছিলেন। তবে আশার মন জয় করেছিলেন রবি আসেকা নামের এক সুরকার। রবিও আশাকে তার প্রিয় সংগীত শিল্পীর জায়গা দিয়েছিলেন। দুজনের কাজের শুরুটা মজার ছিল। ওয়াক্ত, চৌধবীঁ কা চাঁদ, গুমরাহ, বহু বেটি, চায়না টাউন, আদমি অউর ইনসান, ধুন্দ ও হামরাজ। চৌধবীঁ কা চাঁদ সিনেমার গানগুলোতে রবি চেয়েছিলেন প্রযোজকের স্ত্রী গীতা দত্তকে। কিন্তু গীতা অস্বীকৃতি জানালে আশা ভোঁসলের কণ্ঠে গানগুলো তুলে দেন তিনি।

কিংবদন্তি সংগীত পরিচালক সুরকার শচীন দেব বর্মন লম্বা সময় বলিউড শাসন করেছেন। তার সঙ্গে জুটি ছিল লতা মঙ্গেশকারের। ১৯৫৭ সালে এসে মনোমালিন্য হয় তাদের। ফাটল ধরে জুটিতে। এটি মেঘ না চাইতে বৃষ্টি নামায় আশার ক্যারিয়ারে। কেননা ওই সময় শচীন কর্তা লতার বিকল্প হিসেবে নেন তারই সহদোরা আশাকে। আশাও মান রেখেছিলেন। শচীনের সংগীতে একাধিক গান জনপ্রিয়তা পেয়েছিল তার কণ্ঠে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য কালা পানি, কালা বাজার, ইনসান জাগ উঠা, সুজাতা ও তিন দেবিয়াঁ।

১৯৪৩ সালে 'চল চল নব বল' গানের মাধ্যমে শুভ সূচনা হয়।

২০০৮ সালে ভারত সরকার এ গায়িকাকে ভূষিত করে পদ্মবিভূষণ পদকে।

২০১১ সালে সর্বোচ্চ সংখ্যক গান রেকর্ডের কারণে গিনেস বুকে নাম ওঠে তার।

শচীন দের বর্মনের ছেলে রাহুল দেব বর্মনের সঙ্গেও জুটি বেঁধে কাজ করেছেন আশা। গায়িকা যখন দুই সন্তানের মা তখন রাহুলের সঙ্গে দেখা। বলিউডে গানের ধারা বদলে দিয়েছিলেন রাহুল। সংগীতে এনেছিলেন পশ্চাত্যের ছোঁয়া। এ সময় রাহুলের কাছে এক্সপেরিমেন্টাল ভয়েস ছিল আশা ভোঁসলের। রাহুল-আশা জুটি ভীষণ সমাদৃত হয়েছিল শ্রোতদের কাছে।

প্রতিদ্বন্দ্বী যখন বড় বোন

একটা সময় পুরো বলিউড লতা মঙ্গেশকারের দখলে ছিল। বাকি গায়িকাদের কণ্ঠ যেন ম্লান হয়ে যেত তার গায়কীর কাছে। এ সময় বড় বোনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ধরা দেন আশা। এক দশক দুই দশক নয়, দুই বোনের দখলে দীর্ঘ পাঁচ দশক ছিল বলিউড। একাধিকবার লতাকে টপকেও গেছেন আশা। ১৯৮৭ সাল আশা ভোঁসলের জন্য ভীষণ সোনা ফলা ছিল। এ সময় তিনি কাজ করতেন সুরকার ওপি নায়েরের সঙ্গে। তার সুরে নয়া দৌড়, আশা, নবরঙ্গ, মাদার ইন্ডিয়া, দিল দেকে দেখো, পেয়িং গেস্ট চলচ্চিত্রে একের পর এক গান জনপ্রিয় হয় আশার কণ্ঠে। এই গানগুলোর ওপর ভর করেই বড় বোনকে টপকে শীর্ষে উঠে আসেন এই গায়িকা। তবে বেশিদিন ধরে রাখতে পারেননি সিংহাসন। কেননা আশা ভোঁসলেকে নিয়ে কাজ করতেন শুধু ওপি নায়ার। বলিউডের বাকি সুরকারদের আস্থা ছিল লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে। ফলে ভালো ভালো কাজ লতার কাছেই বেশি যেত। এ কারণেই বছর দুয়েক পর সহজেই ছোট বোনের কাছ থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেন লতা। এরপর থেকে বি-টাউনে দাপট দেখালেও বড়বোনের সামনে সুবিধা করতে পারেননি আশা। তাকে টক্কর দিতে লেগে যায় এক দশক। ১৯৭০ সালের দিকে বলিউডে আশার ভিত বেশ মজবুত হয়। তার ওপর আস্থা রাখা সুরকারের তালিকাও বড় হয়। এই দলে ছিলেন আর ডি বর্মন আর কল্যাণজি আনন্দজী। এছাড়া হেমা মালিনী, রাখী, মুমতাজ, মৌসুমী চ্যাটার্জির জন্য যেমন লতার কণ্ঠ ভিন্ন অন্য কিছু ভাবা হতো না তেমনই আশার জন্য বাঁধা ছিল জীনাত আমান, পারভীন ববি, রেখা ও শর্মিলা ঠাকুর। ফলে বড় বোনের সঙ্গে টক্কর বেশ জোরেশোরেই দিয়েছিলেন ছোট বোন আশা।

বৈচিত্রময় ব্যক্তিগত জীবন

আশা ভোঁসলের ক্যারিয়ার যেমন উত্থান পতন রয়েছে তেমনই বিচিত্র ভরপুর তার ব্যক্তিগত জীবন। কৈশোরে প্রেমে পড়েছিলেন নিজের চেয়ে দ্বিগুণ বয়সী এক ভদ্রলোকের। তিনি ছিলেন বড় বোন লতা মঙ্গেশকরের ব্যক্তিগত সহকারী গণপতি ভোঁসলে। তার হাত ধরে পালিয়ে শুরু করেন জীবনের নতুন অধ্যায়। নিজের সহকারীর সঙ্গে ছোট বোনের বিয়ে কোনদিনই মেনে নেননি লতা। ফলে দুজনের মুখ দেখা দেখিও বন্ধ হয়ে যায়। অল্প বয়সে গণপতিকে বিয়ের সিদ্ধান্ত ভুল ছিল আশার। কেননা সে ঘরে সুখ ছিল না। এতটাই অশান্তি ছিল যে একাধিকবার বিচ্ছেদের কথাও উঠেছিল। কিন্তু বিভিন্ন দিক চিন্তা করে আশা ভোঁসলে সংসার ধরে ছিলেন। কিন্তু শেষমেষ আর পেরে ওঠেননি। দ্বিতীয় সন্তান গর্ভাবস্থায় স্বামীর ঘর ছাড়েন। দ্বিতীয়বার সংসার পাতেন নিজের চেয়ে দশ বছরের ছোট আর ডি বর্মনের সঙ্গে। হন বাঙালি ঘরের পুত্রবধূ। রাহুল দেব বর্মনেরও দ্বিতীয় বিয়ে ছিল এটি। কাগজে-কলমে এ ঘর আর ভাঙেনি। তবে ভেঙেছিল বন্ধন। শেষ বয়সে আশার সঙ্গে থাকতেন না আরডি।

বহুমুখী প্রতিভা

আশা ভোঁসলে ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। বিভিন্ন ঘরানার গান কণ্ঠে তুলেছেন। এরমধ্যে রয়েছে পপ গজল ভজন শাস্ত্রীয় সংগীত কাওয়ালী লোকসংগীত। বলিউডমুখী হওয়ায় আশার অধিকাংশ গানই হিন্দি ভাষায়। তবে এর বাইরেও ২০টি ভাষায় গান করেছেন তিনি। তার গাওয়া মোট গানের সংখ্যা ১২ হাজারেরও বেশি। ২০১১ সালে সর্বোচ্চ সংখ্যক গান রেকর্ডের কারণে গিনেস বুকে নাম ওঠে তার।

গেয়েছেন রবীন্দ্রসংগীত

জীবনানন্দ রবি ঠাকুরের ভাষায়ও গান গেয়েছেন আশা। সে সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। বাংলা সিনেমার গান গেয়েছেন। আধুনিক বাংলা গান গেয়েছেন। কণ্ঠে তুলেছেন রবি ঠাকুরের গান। সেসব পেয়েছে জনপ্রিয়তাও। এরমধ্যে আমি ভাবছি ভাবছি ভাবছি নাকি দেখছি দেখছি দেখছি দেখছি, এক নায়িকা একাই ছিল। আজ গুন গুন গুন কুঞ্জে আমার, গুঞ্জনে দোলে যে ভ্রমর সুর তোলে মে উল্লেখযোগ্য।

পুরস্কারে ধন্য

এক জীবনে গান গেয়ে শুধু ভারত নয় গোটা উপমহাদেশের ভালোবাসা পেয়েছেন আশা ভোঁসলে। পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কারও সম্মাননা। দুইবার পেয়েছেন ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। ১৮টি মহারাষ্ট্র রাজ্য চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়া ৪টি বাংলা চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি পুরস্কার, আজীবন সম্মাননাসহ ৯ বার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পেয়েছেন। দুইবার গ্র্যামি পুরস্কারের মনোনয়নও পেয়েছিলেন। পেয়েছেন দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার। ২০০৮ সালে ভারত সরকার এ গায়িকাকে ভূষিত করে পদ্মবিভূষণ পদকে।